14

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL. 23 1999
পৃঃ ২০ কলাম ৩

মফস্বলের শিক্ষা চিত্র

শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য ঃ বাঁয়ে শহরে স্কুলের শিক্ষার্থী, ডানে কাদা মাড়িয়ে জীর্ণ-শীর্ণ স্কুলে চলেছে গ্রামের শিক্ষার্থীরা

প্রতিবেদন ঃ শরিফুজ্জামান পিন্টু
ছবি ঃ ফাইয়াজ হাসান পলাশ

দেশের এক নম্বর সমস্যা কী? --এর কোন সুস্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য জবাব নেই। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও সন্ত্রাসসহ অসংখ্য সমস্যার ভিড়ে আক্রান্ত গোটা দেশ ও জাতি। এসব সমস্যার মধ্যে বেকার সমস্যা এক নম্বর না হলেও দুই অথবা তিন নম্বরে স্থান পাবে নিশ্চিত। আবার প্রায় তিন কোটি বেকারের এই দেশে চাকরি দেবার যোগ্য লোক খুঁজে পওয়া যায় না! বাক্যটি অনেকের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে স্ববিরোধী। এটা যে স্ববিরোধী নয় তা প্রমাণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় জেলাসমূহের একটি হচ্ছে কুমিল্লা। দেশের মফস্বল শিক্ষার চালচিত্র কেমন তা এই কুমিল্লা জেলা দিয়েই শুরু করব। অন্যান্য জেলা দূরে থাক শিক্ষায় তুলনামূলক অগ্রগামী কুমিল্লা জেলায়ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ করতে পারছে না। অবশ্য প্রার্থীর কিন্তু মোটেও অভাব নেই। চৌষট্টিটি জেলাতেই প্রতি শূন্যপদের বিপরীতে গড়ে প্রায় ২০টি আবেদন পড়ছে। কিন্তু পূরণ হচ্ছে না শূন্যপদ। কুমিল্লা জেলায় '৯৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদ ছিল সাড়ে পাঁচ শ'। আবেদন পড়ে সাড়ে আট হাজার। আবেদনকারীদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগই ছিল অতিরিক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থাৎ মাস্টার্স ডিগ্রীধারী। অথচ সাড়ে আট হাজার আবেদনকারীর মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় মাত্র ১শ' ৪০ জন। প্রিয় পাঠক, মফস্বলের শিক্ষা সম্পর্কে আরও ধারণা পেতে চান? প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দৃষ্টান্ত দেবার কারণ হচ্ছে কেবল মফস্বলের বেকাররাই এককভাবে জেলা কোটার ভিত্তিতে এই পদে নিয়োগ পেয়ে থাকে। মফস্বল শিক্ষার চালচিত্র পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠির মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

কুমিল্লা জেলায় ১৯৯৭ সালেও পাঁচ শতাধিক সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদের বিপরীতে প্রায় ১১ হাজার আবেদন জমা পড়ে। কিন্তু পাস করে মাত্র ৫৭ জন। একই বছর জেলায় প্রাথমিক স্কুলগুলোতে প্রধান শিক্ষদের শূন্যপদ ছিল ১শ' ৩৬টি, আবেদন পড়ে ১ হাজার ৪শ' ৪৭টি। আর উত্তীর্ণ হয় মাত্র ৪৭ জন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কুমিল্লার বুড়িচং থানা থেকে সহকারী শিক্ষক পদে পরীক্ষা দেয় প্রায় এক হাজার পরীক্ষার্থী। কিন্তু একজনও পাস করতে পারেনি।

এ তো গেল শিক্ষাদীক্ষায় তুলনামূলক অগ্রগামী কুমিল্লা জেলার চালচিত্র। কেবল রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলো বাদ দিলে সারা দেশের চিত্র কম-বেশি কুমিল্লার মতোই। বিগত কয়েক বছর ধরেই সরকার মফস্বলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি দেবার মতো যোগ্য লোক খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ প্রতিটি পদের বিপরীতে গড়ে ১৯ থেকে ২০ প্রার্থী আবেদন করছে। বিসিএস পরীক্ষার পর দেশজুড়ে যে পরীক্ষা জনপ্রিয় তা হচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। মফস্বলের বেকারদের কাছে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা এখন লোভনীয় চাকরি। অথচ তারা শূন্যপদ পূরণ করতে পারে না। কমন গ্রেস দেবার পরও অধিকাংশ পদ শূন্যই থেকে যায়। একটি প্রবাদ হচ্ছে-- গোড়ায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ঠাস্ ঠাস্। বাংলাদেশের মফস্বল শিক্ষার চিত্রও অনুরূপ। প্রথমেই ধরা যাক মফস্বলের প্রাথমিক শিক্ষার কথা।

আপনি যদি শহরে বসবাস করেন তবে নিজ গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক স্কুলটি সম্পর্কে একটু খোঁজ নিন। আর গ্রামে বাস করলেও আপনি হয়ত ভালভাবে জানেন না গ্রামের প্রাথমিক স্কুলটির কথা। অর্ধ যুগেরও বেশি শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের সাথে জড়িত থেকে এই প্রতিবেদকের মূল্যায়ন হচ্ছে, মফস্বলের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে অবহেলিত। আর শিক্ষাজীবনের শুরুটাই যদি হয় অবজ্ঞা, অবহেলা আর অপর্যাপ্ততার মধ্য দিয়ে সেই শিক্ষার পরিণতি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষাকে তুলনা করা যায় একটি ভবনের ভিত্তির সাথে। ভবনের ভিত মজবুত না হলে এটি যেমন হেলে পড়ে এক সময়ে তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা ভালভাবে শেষ না হলে পরবর্তী শিক্ষার পথও রুদ্ধ হয় স্বাভাবিকভাবে। রাজধানী ঢাকা, বিভাগীয় শহর ও কিছু জেলা সদরে প্রাথমিক শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করছে কিন্ডারগার্টেন। কিন্তু অজপাড়াগাঁয়ে সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। আজও গ্রামের বেশিরভাগ শিশুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় মক্তব, মাদ্রাসা বা পাঠশালায়। এ ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাংলা-আরবী হরফ আর নামতা শেখানো হয় দলবেঁধে। অথচ একই বয়সে শহরের একজন শিশু অভিভাবক বা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে জানে, শেখে ও বোঝে অনেক কিছু। এই প্রতিবেদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, আইডিয়াল স্কুল, উদয়ন স্কুল বা ... নামীদামী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য যে প্রস্তুতি ... লাগে তা মফস্বলের যে কোন প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী... নেই। তাছাড়া নামীদামী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পরী... আগে একজন শিশুর পিছনে খরচ হয় কমপক্ষে পঞ্চাশ হা... আর মফস্বলের একজন শিশু কেবল কথা বলতে পারলেই ... শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। তাকে স্কুল ড্রেস পরতে হয় না, ... অভিভাবকের সাধারণত কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না। ... বৃষ্টিতে ভিজে, গায়ে কাদা মেখে স্কুলে যায় দেশের অধিক... দেশ, জাতি বা পরিবার কতটুকু আশা করতে পারে এ... কাছে থেকে? গ্রীষ্মের দাবদাহে ভরদুপুরে টিনের চালের ... ছাড়াই ক্লাস করে দে... অঞ্চলের শিশু-... বর্ষাকালে ছিদ্র চাল, ... বা জানালা দিয়ে পানি ... খাতা ভেজার দৃশ্য অ... যায়। বেঞ্চের অভাবে ... ফ্লোরে হোগলা বা খেজুরপাতার পাটিতে বসে ক্লাস করতে ... মফস্বলের এই চিত্র যে সর্বত্র তা নয়। সাম্প্রতিককালে ... শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কিছুটা হচ্ছে। ... সঙ্কট, শিক্ষা উপকরণ সঙ্কট থেকেই যাচ্ছে। শিক্ষার অনুকূল ... নিশ্চিত হচ্ছে না।

গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এমনকি শিক্ষিত ও সচেত... অভিভাবকও শিক্ষাজীবনের শুরুতে সন্তানকে মাদ্রাসা ... পড়ানোকে পুণ্যের কাজ মনে করেন। তাঁদের ধারণা, শি... ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা হলে সন্তান বড় হয়ে বিপথগামী ... শুধু তাই নয়, একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আজ... অভিভাবক মানত করে যে, ছেলে হলে মাদ্রাসায় ভর্তি করা ... কোন মানুষের কাছেই এ ধরনের দু'চারটি নজির হয়ে... আধুনিক বিজ্ঞান বলে ভিন্ন কথা এবং এটাই যৌক্তিক। তা হ... বা মেয়ের পার্থক্য নিরূপণ করে যৌন ক্রোমোজম। একজ... যৌন ক্রোমোজমের জোড়াটি তৈরি হয় দুটো এক্স (ঙঙ) ... দিয়ে। আর একজন পুরুষের যৌন ক্রোমোজম জোড়াটি তৈরি হয় এক্স-ওয়াই (ঙচ) নামে দু'টি ক্রোমোজম দিয়ে। এখন পুরুষের এক্স ((ঙ) শুক্রাণুর সাথে নারীর এক্স (ঙ) ডিম্বাণু মিললে সন্তানটি হবে মেয়ে। আবার পুরুষের ওয়াই (চ) শুক্রাণুর সাথে নারীর এক্স (ঙ) ডিম্বাণু মিললে সন্তানটি হবে ছেলে। তাই ছেলে সন্তান লাভের জন্য কোন মানত, ঝাড়ফুঁক বা তাবিজ-কবচের কোন প্রয়োজন হয় না।

প্রচ্ছদ ঃ উত্তম সেন

মাধ্যমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত দেশে একটি কমন সঙ্কট বিরাজ করছে ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিক্ষকের ক্ষেত্রে। দেশে এত বেকার অথচ ইংরেজীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে কেউ বসে আছে এমন নজির নেই। যোগ্যতা অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত চাকরি না মিলতে পারে কিন্তু ইংরেজীতে পাস করে কেউ বসে থাকে না। দেশের অধিকাংশ কলেজে বিশেষ করে মফস্বলের কলেজে ইংরেজী শিক্ষকের প্রকট অভাব রয়েছে। বার বার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও ইংরেজী শিক্ষক পাওয়া যায় না। অনুরূপ সঙ্কট বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষকের ক্ষেত্রেও। দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে প্র্যাকটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের অভাবও প্রকট। লাইব্রেরীর কথা তো মফস্বলে অনেকটা কল্পনাতীত।

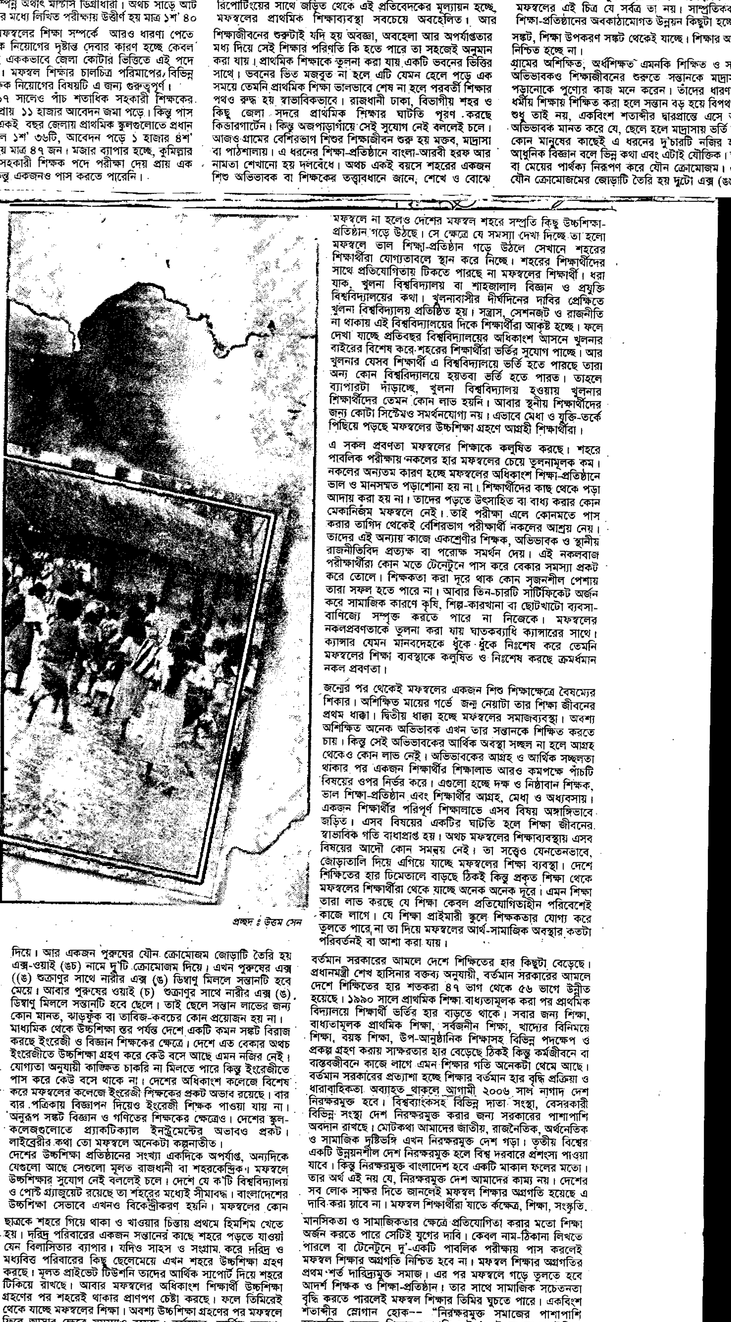

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একদিকে অপর্যাপ্ত, অন্যদিকে যেগুলো আছে সেগুলো মূলত রাজধানী বা শহরকেন্দ্রিক। মফস্বলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। দেশে যে ক'টি বিশ্ববিদ্যালয় ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রয়েছে তা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা সেভাবে এখনও বিকেন্দ্রীকরণ হয়নি। মফস্বলের কোন ছাত্রকে শহরে গিয়ে থাকা ও খাওয়ার চিন্তায় প্রথমে হিমশিম খেতে হয়। দরিদ্র পরিবারের একজন সন্তানের কাছে শহরে পড়তে যাওয়া যেন বিলাসিতার ব্যাপার। যদিও সাহস ও সংগ্রাম করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কিছু ছেলেমেয়ে এখন শহরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। মূলত প্রাইভেট টিউশনি তাদের আর্থিক সাপোর্ট দিয়ে শহরে টিকিয়ে রাখছে। আবার মফস্বলের অধিকাংশ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর শহরেই থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ফলে তিমিরেই থেকে যাচ্ছে মফস্বলের শিক্ষা। অবশ্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর মফস্বলে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে। কর্মক্ষেত্র, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ প্রভৃতি কারণে মফস্বলের উচ্চ শিক্ষাগ্রহণকারী শহরেই ঠাঁই খুঁজছে। আর শহরগুলোর অবস্থা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়-- 'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোট সে তরী'।

মফস্বলে না হলেও দেশের মফস্বল শহরে সম্প্রতি কিছু উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। সে ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা হলো মফস্বলে ভাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে সেখানে শহরের শিক্ষার্থীরা যোগ্যতাবলে স্থান করে নিচ্ছে। শহরের শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না মফস্বলের শিক্ষার্থী। ধরা যাক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাস, সেশনজট ও রাজনীতি না থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ আসনে খুলনার বাইরের বিশেষ করে শহরের শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। আর খুলনার যেসব শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে তারা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তবা ভর্তি হতে পারত। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় খুলনার শিক্ষার্থীদের তেমন কোন লাভ হয়নি। আবার স্থনীয় শিক্ষার্থীদের জন্য কোটা সিস্টেমও সমর্থনযোগ্য নয়। এভাবে মেধা ও যুক্তি-তর্কে পিছিয়ে পড়ছে মফস্বলের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা।

এ সকল প্রবণতা মফস্বলের শিক্ষাকে কলুষিত করছে। শহরে পাবলিক পরীক্ষায় নকলের হার মফস্বলের চেয়ে তুলনামূলক কম। নকলের অন্যতম কারণ হচ্ছে মফস্বলের অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভাল ও মানসম্মত পড়াশোনা হয় না। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পড়া আদায় করা হয় না। তাদের পড়তে উৎসাহিত বা বাধ্য করার কোন মেকানিজম মফস্বলে নেই। তাই পরীক্ষা এলে কোনমতে পাস করার তাগিদ থেকেই বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী নকলের আশ্রয় নেয়। তাদের এই অন্যায় কাজে একশ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় রাজনীতিবিদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন দেয়। এই নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা কোন মতে টেনেটুনে পাস করে বেকার সমস্যা প্রকট করে তোলে। শিক্ষকতা করা দূরে থাক কোন সৃজনশীল পেশায় তারা সফল হতে পারে না। আবার তিন-চারটি সার্টিফিকেট অর্জন করে সামাজিক কারণে কৃষি, শিল্প-কারখানা বা ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পৃক্ত করতে পারে না নিজেকে। মফস্বলের নকলপ্রবণতাকে তুলনা করা যায় ঘাতকব্যাধি ক্যান্সারের সাথে। ক্যান্সার যেমন মানবদেহকে ধুঁকে ধুঁকে নিঃশেষ করে তেমনি মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত ও নিঃশেষ করছে ক্রমবর্ধমান নকল প্রবণতা।

জন্মের পর থেকেই মফস্বলের একজন শিশু শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। অশিক্ষিত মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়াটা তার শিক্ষা জীবনের প্রথম ধাক্কা। দ্বিতীয় ধাক্কা হচ্ছে মফস্বলের সমাজব্যবস্থা। অবশ্য অশিক্ষিত অনেক অভিভাবক এখন তার সন্তানকে শিক্ষিত করতে চায়। কিন্তু সেই অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হলে আগ্রহ থেকেও কোন লাভ নেই। অভিভাবকের আগ্রহ ও আর্থিক সচ্ছলতা থাকার পর একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ আরও কমপক্ষে পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এগুলো হচ্ছে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক, ভাল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মেধা ও অধ্যবসায়। একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিক্ষালাভে এসব বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এসব বিষয়ের একটির ঘাটতি হলে শিক্ষা জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অথচ মফস্বলের শিক্ষাব্যবস্থায় এসব বিষয়ের আদৌ কোন সমন্বয় নেই। তা সত্ত্বেও যেনতেনভাবে, জোড়াতালি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থা। দেশে শিক্ষিতের হার ঢিমেতালে বাড়ছে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা থেকে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা থেকে যাচ্ছে অনেক অনেক দূরে। এমন শিক্ষা তারা লাভ করছে যে শিক্ষা কেবল প্রতিযোগিতাহীন পরিবেশেই কাজে লাগে। যে শিক্ষা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতার যোগ্য করে তুলতে পারে না তা দিয়ে মফস্বলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কতটা পরিবর্তনই বা আশা করা যায়।

বর্তমান সরকারের আমলে দেশে শিক্ষিতের হার কিছুটা বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমান সরকারের আমলে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৪৭ ভাগ থেকে ৫৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বাড়তে থাকে। সবার জন্য শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রকল্প গ্রহণ করায় সাক্ষরতার হার বেড়েছে ঠিকই কিন্তু কর্মজীবনে বা বাস্তবজীবনে কাজে লাগে এমন শিক্ষার গতি অনেকটা থেমে আছে। বর্তমান সরকারের প্রত্যাশা হচ্ছে শিক্ষার বর্তমান হার বৃদ্ধি প্রক্রিয়া ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০০৬ সাল নাগাদ দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা দেশ নিরক্ষরমুক্ত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি অবদান রাখছে। মোটকথা আমাদের জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এখন নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়া। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ নিরক্ষরমুক্ত হলে বিশ্ব দরবারে প্রশংসা পাওয়া যাবে। কিন্তু নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ হবে একটি মাকাল ফলের মতো। তার অর্থ এই নয় যে, নিরক্ষরমুক্ত দেশ আমাদের কাম্য নয়। দেশের সব লোক সাক্ষর দিতে জানলেই মফস্বল শিক্ষার অগ্রগতি হয়েছে এ দাবি করা যাবে না। মফস্বল শিক্ষার্থীরা যাতে র্কক্ষেত্র, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানসিকতা ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার মতো শিক্ষা অর্জন করতে পারে সেটিই যুগের দাবি। কেবল নাম-ঠিকানা লিখতে পারলে বা টেনেটুনে দু'-একটি পাবলিক পরীক্ষায় পাস করলেই মফস্বল শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চিত হবে না। মফস্বল শিক্ষার অগ্রগতির প্রথম শর্ত দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ। এর পর মফস্বলে গড়ে তুলতে হবে আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। তার সাথে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারলেই মফস্বল শিক্ষার তিমির ঘুচতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর স্লোগান হোক-- "নিরক্ষরমুক্ত সমাজের পাশাপাশি অবহেলিত মফস্বল শিক্ষার অগ্রগতি চাই।' এই চাওয়া অযৌক্তিক নয়। কারণ দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক মফস্বলেই বাস করে। তাই মফস্বল শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির অর্থই দেশের সামগ্রিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন।